সংবাদ
নাগরিক মঞ্চ

মাসিক পত্রিকা

নভেম্বর - ডিসেম্বর, ২০১৩

এই সংখ্যায় থাকছে

শ্রম, শ্রমিক, উৎপাদন, উন্নয়ন ২

নাগরিক মঞ্চ ঃ ফেলে আসা দেড় দশক ৪

স্ট্রীট ভেন্ডরস বিল, ২০১২ ৫

ভারতবর্ষে ২২ লক্ষেরও বেশি তাঁতি উচ্ছেদ হয়েছেন ৭

গৃহকর্মীদের জন্য আইন ৮

গঠিত হলো এন জি ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ৯

ফিরে দেখা ১০

নাগরিক মঞ্চ ঃ পঁচিশে পা ১২

আমাদের কথা

কোন দিনই আমাদের একটা নিজস্ব মুখপত্র থাকতেই হবে — এটা ভাবা হয়নি। তাই সীমাবদ্ধতা যখনই গ্রাস করেছে, আর্থিক সংকট যখন প্রকটভাবে বেড়েছে, আমরা মঞ্চ সংবাদ প্রকাশ বন্ধ রেখেছি। রাখতে বাধ্য হয়েছি এটা বলা বোধহয় সত্যি নয়। কেননা অন্যান্য কাজ তো এর মাঝেই চালু থেকেছে তবে 'মঞ্চ সংবাদ' বন্ধ হল কেন? কারণ, সাময়িকভাবে আমাদের মনে হয়েছে, আছে তো অনেক কাগজ — দৈনিক, সাময়িক, বন্ধুদের ছোট পত্রিকা — এ'সব বিষয় নিয়েই। অনেকবার, অনেক সমভাবসম্পন্ন বন্ধুদের তরফে অভিযোগ, অনুযোগ হয়েছে —'আপনাদের কাগজটা বন্ধ করে দিলেন (!)'

বর্তমান সময়টা খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। নানান স্কিম/প্রকল্পে অধিকার সম্প্রসারণ ঘটছে, না অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে আছে অনেক প্রশ্ন। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার, বঞ্চনার, আবার ঘুরে দাঁড়ানোর বিকল্প উদ্যোগের অনেক ক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে মানুষের এসব কথা শুনি, জানতে পাই। সেসব কোথাও প্রকাশ পায় না। অনেক তথ্য আসে দেশ বিদেশের, জমা হয়ে থাকে। হয়ত লেখা হয় তবু প্রকাশ পায় না। শুনতে হয় বড় কাগজে এসব বিকোয় না তাই প্রকাশ হয়না। বেরোলেও বক্তব্য ছেঁকে যা দাঁড়ায় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই জটিল হয়ে সত্যটা বা বক্তব্যটা হারিয়ে যায়। এছাড়াও দল বা গোষ্ঠীর কাগজ আছে — থাকতে হয়। এরকম অবস্থায় আবার আমাদের 'মঞ্চ সংবাদের' প্রকাশের চেষ্টা। আশা করি সাহায্য পাব। পরামর্শ পাব।

নাগরিক মঞ্চ ২৫ এর সাম্প্রতিক কিছু কাজ :

- নাগরিক মঞ্চ ওয়েব সাইট চালু হল গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ www.nagarikmancha.org
- নাগরিক মঞ্চর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার বিকাল ২ - ৬ টা 'আইনি সহায়তা কেন্দ্র' চালু হয়েছে। শিল্প, শ্রম, পরিবেশ নিয়ে যে কোন বিষয়ে আলোচনার/পরামর্শের জন্য ২৩৭৩-১৯২১ এবং ৯৮৩০২৭১০৮১ এই নম্বরে যোগাযোগ করুন।
- মঞ্চ সংবাদ (দ্বিমাসিক) আবার নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- পেশাগত রোগ নির্ণয়-এর লক্ষ্যে ডাক্তার বন্ধুদের সহায়তায় খুব শীঘ্রই মেডিকেল ক্লিনিক চালু হবে।
- ১৯৮৯ - ২০১৩ নাগরিক মঞ্চের ২৫ বছরের সংকলন প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রম, শ্রমিক, উৎপাদন, উন্নয়ন

নাগরিক মঞ্চের ২৫ বছর হলো। ২৫ বছরটা মনে রাখতে, অচ্যুতানন্দ দাশ, দাশদাকে, দাশদার কাজ, কথাকে মনে করে, একটি আলোচনা হলো ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩, রামমোহন লাইব্রেরি সভাগৃহে। আলোচনার বিষয়, নাগরিক মঞ্চ সংগঠনের মূল কাজের বিষয়কে খেয়াল রেখে, ঠিক করা ছিল। শ্রম, শ্রমিক, উৎপাদন, উন্নয়ন। আলোচনা করলেন, যারা অনেকদিন ধরে এবং এখনও শ্রম নিয়ে, শ্রমিক নিয়ে ভাবনা করেন, সংগঠন করেন, আন্দোলন করেন।

আলোচনাটির সঞ্চালক ছিলাম আমি। যতটা সম্ভব মন দিয়ে সবটা আলোচনা শুনেছি, যতটা পারি জরুরি কথাগুলি ছোট ছোট করে লিখে রেখেছি। এখন সেই লেখা পাতাগুলি সামনে নিয়ে এই লেখাটা লেখা। আমার মতন করে কথাগুলি, কথাবলা বিষয়গুলি, সাজিয়েছি। বক্তা ধরে সাজাইনি, বিষয় ধরে সাজিয়েছি।

বিষয় এক ।। শ্রম ব্যবস্থায় বদল

উৎপাদন ব্যবস্থায়, পদ্ধতিতে পরিবর্তন। ফলে কর্মব্যবস্থায়, শ্রম ব্যবস্থায় পরিবর্তন। কাজের জায়গার ধরণ বদলে দেওয়া, ফলে কাজের ধরণ বদলে দেওয়া, ফলে কাজে নিয়োগের ধরণ বদলে দেওয়া, ফলে শ্রমিকের ধরণ বদলে দেওয়া। একটি কাজকে, একটি কারখানাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলাদা করে দেওয়া। একসাথে থাকা বড়ো একটা শ্রমিক দলকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট করে, আলাদা আলাদা করে দেওয়া। শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করা।

'শ্রমিক' এই বর্গের মধ্যে ভাগ আনা। নারী এবং পুরুষ একই সঙ্গে 'শ্রমিক' বর্গের মধ্যে ছিল। এখন এই বর্গে ভাগ এনে 'নারী শ্রমিক' বলে আলাদা একটা বর্গ বানানো হলো। শ্রমিকদের ভাগ করা গেল।

মূল কারখানার কাজকে ভাগ করে বাইরে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতির নাম 'আউটসোর্সিং'। একই কাজ কিন্তু শ্রমিক ভাগ। 'ভিতরের শ্রমিক' আর 'বাইরের শ্রমিক', একই কাজে দু'দল, কিন্তু যোগাযোগ থাকলো না। রাখা হলো না।

একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থায়ী কাজ। তার পুরোটাই কিংবা একটি অংশকে অস্থায়ী করে দেওয়া হলো। স্থায়ী কাজের স্থায়ী শ্রমিককে অস্থায়ী কাজের 'অস্থায়ী শ্রমিক' বানিয়ে দেওয়া হলো। এই ব্যবস্থাপনার আর এক ধরণ। সংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থাকে অসংগঠিত বানিয়ে দেওয়া এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে 'অসংগঠিত শ্রমিক' বানানো। অথবা সংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থাতেও 'অসংগঠিত শ্রমিক' বানানো।

উৎপাদন ব্যবস্থায়, শ্রমিকের শ্রম ব্যবহার ব্যবস্থায় পরিবর্তন। উৎপাদনে শ্রমিক নিয়োগ করা, কিন্তু তাকে কাজে না লাগানো, বসিয়ে রাখা। এই ব্যবস্থাটির নাম 'বেনচিং', বসিয়ে রাখা। 'বসিয়ে রাখা শ্রমিক'।

শ্রম নিয়োগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন। শ্রমিক নিয়োগে সরাসরি কারখানার মালিক নয়। শ্রমিক সরবরাহ সংস্থা। শ্রমিকের সঙ্গে কারখানা মালিকের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক সরবরাহ সংস্থার সঙ্গে।

এরই আর একটা চেহারা 'ঠিকাদার সংস্থার শ্রমিক'। একটা ব্যবস্থা কারখানা মালিকের 'ঠিকা শ্রমিক'। আর একটা, কারখানার কাজে 'ঠিকাদারের শ্রমিক'। ঠিকাদারের শ্রমিকের সঙ্গে কারখানার মালিকের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই।

বিষয়টাকে এইভাবে বুঝতে হবে। একটা উৎপাদন ব্যবস্থায়, কারখানায়, শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক দ্বন্দ্বের সম্পর্ক, মুখোমুখি সরাসরি দ্বন্দ্বের সম্পর্ক।

উৎপাদন ব্যবস্থায় বদল, শ্রম ব্যবস্থায় বদল, শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থায় বদল, শ্রমিক বর্গে বদল, এমন সব বদলের প্রধান উদ্দেশ্য এই সম্পর্ককে, শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্বকে, মুখোমুখি, সরাসরি দ্বন্দ্বকে বদলে দেওয়া, পালটে দেওয়া, কমিয়ে দেওয়া, বন্ধ করে দেওয়া,নষ্ট করে দেওয়া।

আর একটা ব্যাপার ঘটছে। উৎপাদন ব্যবস্থাকে, পদ্ধতিকে এমন ভাবে বানানো হচ্ছে, বদলানো হচ্ছে, যাতে শ্রমিক কম লাগে। উদাহরণ, এখন সব প্রস্তাবিত কয়লা খনিগুলোকে 'খোলামুখ কয়লা খনি', 'ওপেন কাস্ট মাইনিং' হিসেবে ভাবা হচ্ছে। এতে কম শ্রমিক কাজ পাবেন।

আসলে সব মিলিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রম ব্যবস্থা, শ্রমিক ব্যবস্থা ছিল তা ক্রমশঃ বদলে দেওয়া হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন, এই বদলে দেবার কারণ কি? সংগঠিত শ্রমিককে অসংগঠিত, স্থায়ী শ্রমিককে অস্থায়ী, মালিক নিযুক্ত শ্রমিককে ঠিকাদার নিযুক্ত শ্রমিক, শ্রমিক সরবরাহকারী সংস্থার শ্রমিক বানাতে পারলে, 'শ্রমিক' বর্গকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে পারলে, শ্রমিকদের যা আইনি পাওনা, ন্যায্য প্রাপ্য, শ্রমিকের অধিকার ধারণায় যে প্রাপ্তি, তা থেকে 'নতুন'

করে বানানো শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যাবে। কাজের নির্দিষ্ট ঘন্টা, শ্রমিকদে র স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা রক্ষা, বেতন কাঠামো, শ্রম আইনের প্রয়োগ, এমন সব কিছু বদলে দেওয়া যাবে। না মানলেও হবে। বলা যাবে, ওসব তো 'পুরনো ধারণা'র শ্রমিকদের জন্য। 'নতুন' ধারণার, ধরণের শ্রমিকদের জন্য নয়। নিয়ম ছিল একই কাজে একই বেতন। 'নারী শ্রমিক', 'অস্থায়ী শ্রমিক', 'ঠিকাদারি শ্রমিক', এমন সব 'নতুন' ধরণের শ্রমিক বানিয়ে দিয়ে তেমন নিয়ম না মানলেও চলবে।

আর একটা বড়ো উদ্দেশ্য উৎপাদন ব্যবস্থায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক সরাসরি, মুখোমুখি, প্রত্যক্ষ, আইনী, অধিকার বিষয়ক দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যাওয়া, সরিয়ে দেওয়া, মুছে ফেলা। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যে সমাজ গঠন, যে রাজনীতি গঠন, তা নষ্ট করে দেওয়া।

বিষয় দুই ।। এমনটা সম্ভব হচ্ছে কেন ?

প্রথমতঃ শ্রমিক আন্দোলনের, বা ঠিকঠাক বললে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যর্থতা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে 'নতুন বানানো শ্রমিক'দের যোগাযোগ না হওয়া। যোগাযোগের সমস্যা থাকা। এটা যেমন একদিকে, অন্য দিকে এই 'নতুন ধরণের শ্রমিক' বানানোকে ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থন করছে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকদের বিষয়ে নীতি বানানোয় শ্রমিকরা নেই। প্রশাসনে নেই, সংগঠনেও নেই। সরকারের ডাকা লেবার কনফারেন্সে শ্রমিকরা নেই। সরকারের নীতি বানানোয় শ্রমিকদের কথা পৌঁছয় না। শ্রমিক সংগঠনে অশ্রমিকরা। শ্রমিকরা তাদের নিয়ে বানানো নীতি, আইন, প্রকল্প বিষয়ে অশ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল। শ্রমিকদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা হয় না। তাদের কথা তাদের মুখ দিয়ে বলানোর ব্যবস্থা করা হয় না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত।

তৃতীয়তঃ শ্রমিকদের মধ্যে ভাবনাগত পরিবর্তন। 'নতুন ধরণের শ্রমিক'রা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, শ্রমিকদের অধিকার পাওয়ার জন্য আন্দোলনের ধারাবাহিকতা জানেন না। শ্রমিকদের লড়াইয়ের মানসিকতাও বদলে যাচ্ছে। তাদের মত হলো নেতারা তো খাবেই, তা খাক, আমাদের একটু দিলেই হবে। একটা সমঝোতার মানসিকতা।

চতুর্থতঃ এখন একই সঙ্গে শ্রমিকদের দাবি খানিকটা মেটানো এবং শ্রমিক আন্দোলনের ওপর আক্রমণ একই সাথে। প্রমাণ করতে চাওয়া, শ্রমিকদের দাবি পূরণ করা আর শ্রমিক আন্দোলন, এদুটির মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই। শ্রমিকদের দাবি মেটানো হলো আন্দোলনের জন্য নয়। আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে আনা।

পঞ্চমতঃ শ্রম দপ্তর শ্রমিকদের পক্ষ ছেড়ে মালিকদের পক্ষে সরে গেছে।

ষষ্ঠতঃ শ্রমিকদের বিষয় সমাজ থেকে সরে গেছে। যেমন, বন্ধ কারখানার বিষয়টা, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বিষয়টা সমাজে কোনও সাড়া জাগাতে পারলো না। সমাজ এমন সাংঘাতিক অন্যায়ে নীরব থেকে গেল। শ্রমিক আন্দোলন সমাজের কাছে আসতে পারছে না। একটা পারস্পরিক যোগাযোগহীনতা। এতে ক্ষতি শ্রমিক আন্দোলনের, সামাজিক আন্দোলনেরও।

বিষয় তিন।। কি করা দরকার

এক, শ্রমিক আন্দোলনের আত্মসমালোচনা। ভাবনাগত দৈন্য, শূণ্যতা দূর করা। নতুন ধরণের লড়াই গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ তৈরি করা। পুঁজি যখন আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে, শ্রমিক আন্দোলনকেও আন্তর্জাতিক হতে হবে।

দুই, কারখানা স্তরে, সরকারি স্তরে, নীতি বানানোয় শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ। শ্রম ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনায়, বিতর্কে, শ্রমিকদের মতামত জানানো।

তিন, শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন। নিজেদের অধিকার নিজেদের জানা। নিজেরাই কথা বলতে যাওয়া মালিকদের সঙ্গে।

চার, শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বকে সরাসরি, মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। শ্রমিকদের কিছু পেতে গেলে মালিককেই লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে হবে, এর মাঝখানে আর কিছু নেই।

পাঁচ, শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ তৈরী করতে হবে। শ্রমিক সহায়ক নাগরিক আন্দোলন বানাতে হবে।

ছয়, মালিক, সরকার যেমন এখন 'নতুন শ্রমিক' বানাচ্ছে, তেমনি শ্রমিকরা, শ্রমিক আন্দোলন নতুন শ্রমিক বানাবে। যেমন, 'আন্দোলনকারী শ্রমিক' — কাজ হারালেও আন্দোলনকারী।

এই সব কথা সেদিন আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছিলেন বিস্তারিত ভাবে, সংক্ষেপে। আমি গুছিয়ে এক জায়গায় রাখলাম। এই ধরণের কথা গোছানোর একটা অসুবিধা আছে। বক্তারা বলার সময় শুধু তো বক্তব্য রাখেন না, তাদের ক্ষোভ, রাগ, হতাশা, আশা, স্বপ্ন প্রকাশিত হয়। এমন সার সংক্ষেপে সেসব ধরা থাকে না।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

নাগরিক মঞ্চ : ফেলে আসা দেড় দশক
কিছু স্মৃতি কিছু মূল্যায়ন

... ১৯৮০-র দশকের শেষে বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এ সংগঠনের(নাগরিক মঞ্চ) সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকের একটি হচ্ছে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে তাদের ওপর কোনরকম সাংগঠনিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা না করা; বরং শ্রমিকরা যাতে নিজেরা আত্মনির্ভরশীল ভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা। অন্যদিক হলো, বিদেশী সাহায্যের ফাঁদে পা না দেওয়া, এবং ফলে নিজেদের ও সহযোগী বন্ধুদের ধ্যানধারণা মতো সংগঠনের কর্মপদ্ধতি ঠিক করা।

এই শুরুর পর প্রায় ১৪ বৎসর কেটে গেছে। এর মধ্যে বহুবিধ দিকে মঞ্চের কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। এর একদিকে রয়েছে পরিবেশ সম্বন্ধে চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ও এই পরিবেশ দূষণের ফলে সবচেয়ে প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রমজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের পাশে দাঁড়ানো, এবং অন্যদিকে রয়েছে বহু সাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছোট-বড় পুস্তিকা ও পত্রিকার প্রকাশ।

■ এই কাজের মধ্যে রয়েছে কলকাতার পাশের জলাভূমি আন্দোলনে ঐ জলাভূমির অস্তিত্ব রক্ষা যাদের জীবিকার সঙ্গে জড়িত, সেই শ্রমজীবীদের সংগঠিত হতে সাহায্য করা।

■ প্রতি বৎসর আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের যারা স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের এক এক জনের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ইতিহাস চেতনাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা।

■ বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের একটা মাসিক ভাতা দেবার সফল আন্দোলন শুরু করা।

■ দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকরা সামান্য কিছু যে আইনগত অধিকার অর্জন করেছেন সেগুলিকে বাস্তবে চালু করার জন্য দল-মত নির্বিশেষে সমস্ত ট্রেড-ইউয়িন যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে তার জন্য চেষ্টা করা।

■ এই চেষ্টার মধ্যে পড়ে পেশাগত রোগের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে আন্দোলনের সূচনা করা এবং ঝাড়গ্রামের পাথরভাঙ্গা শ্রমিকদের ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করা।

■ ই এস আই এবং পি এফ -এর সুযোগ থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ মালিকদের লুঠের চেষ্টার বিরুদ্ধে সব শ্রমিক সংগঠন মিলে যৌথ আন্দোলনের চেষ্টা করা।

■ বন্ধ কারখানাগুলো, বিশেষ করে যেগুলি সরকার অধিগ্রহণ করেও চালু করছে না, সেগুলিকে শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে চালাবার চেষ্টা করা, ইত্যাদি।

আমার মনে হয় এই মঞ্চের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে শ্রমজীবীদের দৈনন্দিন সর্ববিধ বঞ্চনার বিরুদ্ধে এখনই এই চলতি ব্যবস্থার মধ্যেই যা যা করা যায় তা করার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ব্যস্থার বিকল্প নিয়ে, দীর্ঘমেয়াদি চলার দিশা নিয়ে, যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করা। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৯১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কলকাতার (জোকা) আই আই এম -এ শ্রী মনমোহন সিং, চিদাম্বরম প্রমুখ 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' নিয়ে যে আলোচনা সভা করেন সেইখানে খুব সম্ভবত নাগরিক মঞ্চই ছিল একমাত্র সংগঠন যারা সোজাসুজি ঐ 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি'র বিরোধিতা করেছিল।

চলতি অবস্থার মধ্যেই শ্রমজীবীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য 'এখনই যা যা করা যায়' তা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী সহ সমগ্র দেশের চলতি দুর্দশার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে চলতি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে, যে বিকল্প সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন, তার মোটামুটি কাঠামো স্থির করা। এই শুভ ভবিষ্যতে 'যা বস্তুগতভাবেই সম্ভব' সেই দিশায় যাবার জন্যই আশু সমস্ত কাজ করা —এই বোধহয় দেশের কাছে নাগরিক মঞ্চের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিক।

(মার্চ, ২০০৪ এ মঞ্চ সংবাদ-এ প্রকাশিত নাগরিক মঞ্চের সভাপতি অজিত নারায়ণ বসুর লেখাটির অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিত হল)

স্ট্রীট ভেন্ডরস (প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রীট ভেন্ডিং) বিল, ২০১২

হকার সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হকার সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ, চেয়ারম্যান তুষার তালুকদার ও নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক নব দত্ত। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় যে ভারতে হকারদের সব থেকে বড় সংগঠন, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন, ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে হকার সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়নের জন্য সারা দেশে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ২৫টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্র শাসিত রাজ্যের ৮০০টি অদলীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নানান সংগঠনের সমাহারে গঠিত ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের এই দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে স্ট্রীট ভেন্ডরস (প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অব স্ট্রীট ভেন্ডিং) বিল, ২০১২, লোকসভায় গৃহীত হয়। এই বিলটিতে হকারদের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা, শহরের রাস্তায় ব্যবসা করার নানান বিধি প্রণীত হয়েছে।

এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হল শহরে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে উচ্ছেদ এবং হয়রানি ছাড়া হকারদের কিভাবে ব্যবসার সুযোগ করে যেওয়া যায় তার বিধি প্রণয়ন করা।

স্ট্রীট ভেন্ডরস (প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অব স্ট্রীট ভেন্ডিং) বিল, ২০১২র মূল বিষয়সমূহ :

১. এই বিলের বিষয়গুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে দেশের প্রত্যেকটি স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা একটি টাউন ভেন্ডিং অথরিটি তৈরী করবে। দেশী (ন্যাচার‍্যাল) বাজার/হাট নির্ধারণ করা, স্ট্রীট ভেন্ডিংয়ের পরিকল্পনা নির্ধারিত করা, হকারির স্থান নির্ণয় করা, হকারদের সমীক্ষা করা ইত্যাদি নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এই কমিটি। কমিটিতে সরকারী আমলা ব্যক্তি ছাড়াও কমিটির ৪০ শতাংশ হবেন নির্বাচিত হকার প্রতিনিধি,যার এক তৃতীয়াংশ মহিলা। এছাড়াও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়সমূহ এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৩. কোন রকম পক্ষপাতকে নির্মূল করতে এই বিল ন্যূনতম প্রত্যেক ৫ বছর অন্তর একটি সমীক্ষা করে ভেন্ডিং জোনে বিশেষ করে মহিলা, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়সমূহ এবং প্রতিবন্ধীদের গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসার জন্য তাদের শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

৪. এখন যারা শহরের ফুটপাথে ব্যবসা করেন, তাঁরা এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবেন, তবে এই ভেন্ডিং জোনের পরিমাণ হবে সেই ওয়ার্ডের, জোনের বা শহরের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ।

৫. যেখানে দেখা যাবে নির্দিষ্ট ভেন্ডিং জোনে হকারদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাচ্ছে, সেখানে টাউন ভেন্ডিং কমিটিকে নানান বিষয় বিবেচনা করে প্রত্যেক হকারকে শংসাপত্র দিতে হবে যাতে সেই হকারদের উচ্ছেদ, পুনর্বাসিত না করে আশেপাশের ভেন্ডিং জোনে ব্যবসার সুযোগ তৈরী করে দেওয়া যায়।

৬. এই বিলটি পাস হওয়ার আগে থেকে যাদের রাস্তায় ব্যবসা করার শংসাপত্র রয়েছে তাদের প্রত্যেককে নতুন করে যতক্ষণ না শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের হকার হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

৭. যতক্ষণ না নতুন করে সমীক্ষা হচ্ছে এবং প্রত্যেককে শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কোনও হকারকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

৮. কোনও হকার মারা গেলে বা দুর্ঘটনায় চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে গেলে প্রাথমিক ভাবে তাঁর স্ত্রী বা সন্তানকে সেই লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ না হওযা পর্যন্ত সেই নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবসা করতে দিতে হবে।

৯. পুনর্বাসন বা স্থানান্তর, উচ্ছেদ এবং তাদের মালপত্র জব্দ করে নেওয়ার পদ্ধতিটিও নির্দিষ্ট এবং হকার স্বর্থবাহী হবে। সেই স্থানীয় স্বশাসিত সংগঠনটির এই সব কাজের জন্য টাউন ভেন্ডিং কমিটি নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনা এবং নীতিমালা গ্রহণ করবে।

১০. হকারদের পুনর্বাসন বা স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হবে হকার ব্যবস্থাপনার শেষতম পদ্ধতি। এর জন্য বিলের দ্বিতীয় তফশিলে নির্দিষ্ট কিছু নীতি প্রণীত হয়েছে :

ক) পুনর্বাসন বা স্থানান্তর যতদূর সম্ভব না করা যায় তা দেখতে হবে। জোনের এবং নির্দিষ্ট জমিটির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব নির্ধারণ করেই একমাত্র পুনর্বাসন বা স্থানান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে;

খ) যে সব হকারকে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে তিনি/তাঁরা বা তাঁর/তাঁদের প্রতিনিধি এই পরিকল্পনা ও তাকে বাস্তবায়িত করার কাজে সরাসরি যুক্ত থাকবেন;

গ) পুনর্বাসন বা স্থানান্তর করা হকারদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নই হবে পুনর্বাসনের বা স্থানান্তরণের অন্যতম উদ্দেশ্য, অন্ততঃ তার পুনর্বাসনের বা স্থানান্তরণের আগের

জীবিকার মান যাতে বজায় থাকে যে বিষয়ে নজর দিতে হবে;

ঘ) যেসব দেশীয় (ন্যাচারাল) বাজারের হকারেরা ৫০ বছরেরও বেশী সময় ব্যবসা করছে সেগুলিকে ধ্রুপদী বা ঐতিহ্যসম্পন্ন বাজারের মর্যাদা দিতে হবে;

১১. টাউন ভেন্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক ৫ বছর অন্তর স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলো হকারদের বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা করবে, যাতে হকারদের ব্যবসার পরিবেশ বজায় থাকে এবং আগামী দিনে হকারির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি বরাদ্দ হয়;

১২. এই বিলে বলা হয়েছে নো-ভেন্ডিং জোন তৈরী হবে এইসব নীতি অনুসারে —

সমীক্ষায় কোন দেশী (ন্যাচারাল) বাজার/হাটকে নো-ভেন্ডিং জোন ঘোষণা করা যাবে না; যত কম হকার উচ্ছেদ/পুনর্বাসিত হয় এমন একটি স্থানে নো-ভেন্ডিং জোন তৈরী করতে হবে; হকারদের সমীক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে নতুন পরিকল্পনা না হওয়া পর্যন্ত নো-ভেন্ডিং জোন ঘোষণা করা যাবে না।

১৩. এই বিলে আরও বলা হয়েছে — বর্তমানে চালু দেশী (ন্যাচারাল) বাজার/হাটের বাস্তবতা এবং অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হকারদের স্থান নির্দিষ্ট করা হবে।

১৪. বিচার ব্যবস্থায় কাজ করা একজন প্রাক্তন আমলা/আধিকারিককে প্রধান চেয়ারম্যান মনোনীত করে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫. যে সব দ্রব্য প্রশাসন হকারদের থেকে জোর করে জমা নিচ্ছে, সেই সব পচনশীল, অপচনশীল দ্রব্য ফেরৎ পাওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা এই বিলে করা হয়েছে।

১৬. ঋণ, বীমা এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্প, গবেষণা, হকারদের ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ইত্যাদি হকার-কেন্দ্রীক প্রকল্পগুলো যাতে হকারদের জন্য তৈরী হয় সে বিষয়ে এই বিলে প্রচারের সুযোগ রেখেছে।

১৭. এই বিলে পুলিশ এবং অন্যান্য প্রশাসনের হয়রানির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি ওভাররাইডিং ক্লজেরও ব্যবস্থা রয়েছে যাতে তারা হয়রানি উপেক্ষা করে ব্যবসা করতে পারেন।

১৮. এই বিলটিতে বলা হয়েছে, বিলটি গ্রহণের এক বছরের মধ্যে বিলের রুলগুলি নোটিফিকেশন করতে হবে এবং ছ'মাসের মধ্যে প্রকল্পগুলি নোটিফিকেশন করতে হবে।

এই আইনটি দ্রুত এবং আইনের নানা ধারা, উপধারাকে বাস্তবে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন দাবি করেছে —

১) এই আইন প্রয়োগ করতে আশু একটি সেন্ট্রাল মনিটরিং টাস্ক ফোর্স তৈরী করা প্রয়োজন।

২) হকারদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য একটি বিশেষ হকার বোর্ড তৈরী করা প্রয়োজন।

৩) হকারদের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনাকে কর্মচারী রাজ্য বীমা (ই এস আই) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪) রাজীব আবাস যোজনায় এবং জহরলাল নেহেরু আরবান রিনিউয়াল মিশনে প্রত্যেক হকারের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্ল্যানিং কমিশন ও দারিদ্র দূরীকরণ

সম্প্রতি দেশের দারিদ্র দূরীকরণ বিশেষ করে বি পি এল নিয়ে প্ল্যানিং কমিশন একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে দারিদ্র দূরীকরণে বাজেট গ্রহণ সত্ত্বেও দেশে দারিদ্র খুব একটা কমেনি। কেন্দ্রীয় সরকার দাবী করেছে যে সারা দেশে ২০১১-১২তে, ৫৫ হাজার ৭৪৪কোটি টাকা বি পি এল সম্পর্কিত স্কীমে ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৮১২ কোটি টাকা শহরে বি পি এল অন্তর্ভূক্ত পরিবারের জন্য স্কীম বাবদ ব্যয় হয়েছে। ২০১১-১২র ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের ব্যয় সংক্রান্ত সমীক্ষায় বলা হয়েছে ইউ পি এ সরকার ৭২,৮২২.০৭ কোটি টাকা খাদ্যে ভরতুকি বাবদ ব্যয় করেছে। এছাড়া সাতটি স্কীমে খরচ করা হয়েছে ১,০৯,৩৭৯ কোটি টাকা। ২০০৪-এর পর থেকে বছর বছর উপরোক্ত টাকা দারিদ্র দূরীকরণে ব্যয় করা হয়েছে। এটা সরকারের দাবী। বাস্তবে কতটা কি হয়েছে? এই প্রসঙ্গে তাই প্ল্যানিং কমিশনের বক্তব্য খুবই অর্থবহ।

ভারতে বি পি এল সম্পর্কিত স্কীমগুলি

১) স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা ২) জহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা ৩) এমপ্লয়মেন্ট অ্যাস্যুরেন্স স্কীম ৪) ন্যাশনাল সোশাল অ্যাসিস্টেন্স প্রোগ্রাম ৫) ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীম ৬) ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কীম ৭) ন্যাশনাল মেটারনিটি বেনিফিট স্কীম ৮) অন্নপূর্ণা ৯) ডি আর ডি এ ১০) খরাপ্রবণ এলাকা কর্মসূচী এবং সুসংহত পরিত্যক্ত জমি উন্নয়ন প্রকল্প ১১) ডেসার্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ১২) রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা ১৩) গণবন্টন কার্যক্রম ১৪) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ১৪) প্রসব সংক্রান্ত অসুস্থতা কমানো, টীকাকরণ ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী ১৬) ইন্দিরা আবাস যোজনা ১৭) জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্প ১৮) জাতীয় পারিবারিক সহায়তা ১৯) অনাহার ঠেকাতে সাময়িক ত্রাণ ২০) স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্ল্যান, তপশিলি জনজাতি ও বি পি এল ভুক্তদের ২১) মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা ২২) আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা ২৩) কিশোরী শক্তি যোজনা।

ভারতবর্ষে ২২ লক্ষেরও বেশি তাঁতি উচ্ছেদ হয়েছেন বিগত ১৫ বছরে

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতি পাবানাকা লক্ষী সংসদে জানিয়েছেন ১৯৯৫-৯৬ সালে দ্বিতীয় তাঁত সুমারির সময় সারা ভারতে তাঁত শিল্পী ছিলেন ৬৫.৫০ লক্ষ। তৃতীয় তাঁত সুমারি(২০০৯-১০)তে সে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৩.৩১ লক্ষে। অর্থাৎ কমেছে ২২ লক্ষেরও বেশী। দেশের এত সংখ্যক তাঁতি ভারতের গর্বিত তাঁত শিল্পের ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেলেন, উচ্ছেদ হয়ে গেলেন নিজের বাপ-দাদার সংস্কৃতি থেকে, সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র হা-হুতাশ নেই ভারত জনপদে। মন্ত্রী সাহেবা তার বক্তব্য পেশ করে হাত মুছে ফেললেন। বিরোধী পক্ষ হইচই করলেন কোলগেট নিয়ে, ডলারের তুলনায় টাকার দাম পড়া নিয়ে — কিন্তু গ্রামের এই যে কয়েক কোটি প্রযুক্তিবিদ স্রেফ হারিয়ে গেলেন গ্রামের শ্রম মানচিত্র থেকে, সে বিষয়ে কোনও তাপ উত্তাপ নেই। সব কিছু যেন অতি স্বাভাবিক এক ঘটমান বর্তমান। কয়েক বছর আগে অন্য কোন এক কথায় উত্তরবঙ্গের এক প্রখ্যাত কংগ্রেস সাংসদ আলগোছে বলেছিলেন — এসব গ্রামের উৎপাদন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে যাবে। তাই শিল্পায়ন দরকার — এদের মুখে ভাত তুলে দিতে হবে তো! হয়তো কেন্দ্রের, রাজ্যের সরকার এবং বিরোধী পক্ষও একই রকম উন্নয়ন কর্মে বিশ্বাসী। তাই এই অস্বাভাবিক উন্নয়ন মূলক নিস্তব্ধতা!

এই সংখ্যাটা শুধু কয়েক লক্ষ নয় — অনেক অনেক বেশী। উচ্ছেদ হওয়া তাঁতিদের নিজস্ব পরিবারের প্রায় প্রত্যেক সদস্য তাঁতের সাথে জুড়ে কোনও না কোনও কাজ করেন। তাঁতিদের পরিবার পিছু ৫ জন করে সদস্য ধরলে প্রায় ১ কোটি গ্রামীণ মানুষ। এইখানেই শেষ নয়। অন্ততঃ ১০ জন প্রযুক্তি কর্মী প্রয়োজন একটি তাঁত চালাতে। সুতো গোটানো, সুতো রং করা, শাড়ি মাড় দেওয়া সহ আরও হাজারো কাজে জড়িয়ে থাকেন। এই মানুষগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন গ্রামীণ ভারতের কর্ম ইতিহাস থেকে, দেশের মানুষকে বিন্দুমাত্র বুঝতে না দিয়ে। অথচ কারোর মাথা ব্যথা নেই, কোনও হাহাকার নেই। ২ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক এই তাঁতিদের সাথে বেকার হলেন। মোট যত শ্রমিক বেকার হলেন তাঁদের সংখ্যা — ১ কোটি তাঁতি ও তাদের পরিবার আর তাদের সঙ্গে জুড়ে থাকা অন্য ২.২ কোটি শ্রমিক অর্থাৎ ৩.২ কোটি। ভয়াবহ এক সংখ্যা। অথচ ভারতে কোনও হেলদোল নেই। কোনও রাজকীয়, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক জলও ঘোলা হল না — ভারতের জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশেরও বেশী শ্রমিক শ্রম বাজার থেকে হারিয়ে গেলেন।

পনের বছর ধরে, 'তিল তিল করে' বললে শোভা পাবে না, বলতে হবে খুব দ্রুত ভারতের জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশ তাঁতি এবং তাঁতের সঙ্গে জুড়ে থাকা প্রযুক্তিবিদ উচ্ছেদ হয়ে গেলেন। অর্থাৎ এই পরিমাণ মানুষ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সমাজ থেকে নীরবে হারিয়ে গিয়ে শহরে হয় দিন মজুর, নয় হকার বা রিক্সা চালক, কিম্বা বাড়ি তৈরীর শ্রমিক হয়েছেন। অথচ এরা অনাদি অতীত থেকে বয়ে নিয়ে চলেছিলেন ভারতের ঐতিহ্য, দেশে বিকশিত প্রযুক্তি।

এদের হাতের যাদুতে একদা তৈরী হয়েছিল বাংলার বিশ্ব পরিচিতি। এদের মত শিল্পীদের উপর নির্ভর করে ব্রিটিশদের আগে পর্যন্ত বাংলার অর্থনীতি ছিল উদ্বৃত্ত। এই গ্রামীণ শিল্পী-প্রযুক্তিবিদেরা উচ্ছেদের কোপে পড়ে হারিয়ে গেলেন, হয়তো মিশে গেলেন শহর বিকাশের কাজে নিয়োজিত অসংখ্য পরিচয়হীন মুখের সাথে।

এমন নয় যে বাংলার গ্রামের নারীরা শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছেন। যদিও ধুতি পড়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত পুরুষকুল। আজও কোটি কোটি মহিলা বাংলার পারম্পরিক শিল্পকে কোল দিয়ে চলেছেন, শাড়ি তাদের জীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ, অংশ। তাহলে ভুলটা কোথায় হল? ভারত সরকার কাকে সুবিধা দিচ্ছেন? বাজেট বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার ৪৩ লক্ষ পারম্পরিক তাঁতির জীবন জীবিকা, ভারতের ঐতিহ্যের বদলে, অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছে পশ্চিমী পদ্ধতিতে চলা মিল মালিকদের স্বার্থ।

বিগত দশ বছরে বস্ত্র মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণ বাড়লেও পারম্পরিক তাঁত ক্ষেত্রে সরকারী বরাদ্দ কমেছে লক্ষ্যণীয় ভাবে। ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৬-০৭ পর্যন্ত মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে চার গুণ, ৭৩৯.০৪ কোটি টাকা থেকে ৩০৪৫.৭৫ কোটি টাকা। অপর দিকে তাঁত শিল্পীদের বরাদ্দ কমেছে। ১৯৯৭-৯৮তে বস্ত্র শিল্পের মোট বাজেটের ২৭.৫ শতাংশ ছিল হস্তশিল্পের জন্য বরাদ্দ। ২০০৬-০৭এ হস্তশিল্পের মোট বরাদ্দ কমে দাঁড়ায় বস্ত্রশিল্পের মোট বাজেটের ৭.৯ শতাংশ। সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকার ঐতিহ্যমন্ডিত হস্ত বা বস্ত্র শিল্পীদের উৎপাদনের দিকে নজর দিয়ে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বাড়ালেও ভারত সরকার ক্রমাগত সেই বরাদ্দ কমিয়েছে। যদিও ভারতের পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছে, কৃষি শ্রমিকের পরেই ভারতের হস্ত ও বস্ত্র শিল্পীদের সংখ্যা।

তবুও ভারতের সরকারী পরিকল্পনায় বিগত নবম ও দশম পরিকল্পনায় বস্ত্রশিল্পীদের নিয়ে খুব বেশি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

আদতে ভারত সরকারের পরিকল্পনায় বস্ত্রশিল্পীদের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কলের বুনন পরিকল্পনা। গত কয়েকটি পরিকল্পনায় হাতে চালানো তাঁত আর ভারত সরকারের মূল পরিকল্পনা বা গুরুত্বের মধ্যে নেই। সরকারের পরিকল্পনায় চলে এসেছে কলের বুনন শিল্প। বিগত কয়েক বছরের বাজেটে হাতে চালানো তাঁতের বাজেট বরাদ্দ বাড়ার বদলে কাপড়ের কলের বরাদ্দ বেড়েছে অনেক বেশি। হাতের তাঁতের বাজেট বরাদ্দ কমতে থাকার পাশাপাশি আরও একটা ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে, সেটি হল, বাজেট বরাদ্দের যথেষ্ট পরিমাণে পরিকল্পনা মাফিক খরচ না হওয়া এবং বরাদ্দ অবন্টিত থেকে যাওয়া। ২০০৪-০৫ শ্রম বিষয়ক সংসদের স্থায়ী কমিটি তার ষষ্ঠ সমীক্ষায় হাতের তাঁতের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দকে ব্যবহার না করার বিষয়ে সরকারকে নজর দিতে বলেছে। বছরের পর বছর সরকার হাতে চালানো তাঁতের শিল্পীদের জন্য তৈরী বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার করেনি। বিশেষ করে প্রত্যেক বছর যে ভাবে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অর্থ বরাদ্দ বেড়ে চলেছে সেই ট্রেন্ড দেখে কমিটি যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ভারত সরকারের কাছে ঐতিহ্যপূর্ণ তাঁতিদের যেমন কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনই তাঁতিরা বাজেট বরাদ্দের যতটুকু খুদকুঁড়ো পেয়ে থাকতেন, সেটি থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হতে থাকল বছরের পর বছর।

সরকারি পরিকল্পনায় উপেক্ষিত হওয়ায়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, পরিকল্পনার অভাবে হাতে চালানো তাঁতের ক্ষেত্র দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। ১৫ বছরে উচ্ছেদ হয়েছেন ২২ লক্ষেরও বেশি তাঁতি। সরকারের সব নজর আকর্ষণ করতে পেরেছে সংগঠিত বড় কলের কাপড় শিল্প।

বিশ্বেন্দু নন্দ

গৃহকর্মীদের জন্য এরাজ্যে আইন আজও হল না

গৃহপরিচারক/পরিচারিকাদের জন্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেট ২০১২, ১২ মে জাতীয় নীতি প্রণয়নের অনুমতি দিল। এর মাঝে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। এত দেরী হল কেন? দেখা যাচ্ছে ১৯৪৮ এ একটি রেজলিউশন নেওয়া হয়েছে। গৃহ পরিচারিকাদের কাজের অবস্থা নির্ণয়ে ১৯৬৫-৭০ আই এল ও একটি সমীক্ষা করে রিপোর্ট প্রকাশ করে। সুতরাং ভাবনা চিন্তা চলছিল অনেকদিন ধরে। কিন্তু সরকারি স্তরে স্বীকৃতি মিলছিল না, কেন সেটাই প্রশ্ন।

বিতর্ক হল গৃহপরিচারিকারা শ্রমিক, না শ্রমিক নন। বিভিন্ন 'বাদ' অনুযায়ী এই বিতর্ক চলছে। বিতর্কের বলি হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। সময়ের সঙ্গে চিন্তাও বদলেছে। আই এল ও-র ৯৯তম সেশান ২০০১-এ হয়। তার শিরোনাম ছিল 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফর ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স।' পরিসংখ্যান বলছে ২০০৪-০৫ এ গৃহ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৪২ লাখ, তারা কাজ করতো ৮ থেকে ১৮ ঘন্টা (এন এস এস ও - ৬১তম রাউন্ড, ২০০৪-০৫)। গৃহ কর্মীদের এই রাউন্ডে ভাগ করা হয়েছে গৃহপরিচারক/পরিচারিকা, রাঁধুনি, আয়া শিরোনামে।

সেন্সাস ২০০১ অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য স্থানান্তরকারী কর্মীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৮ কোটির মধ্যে প্রায় ৪ কোটি গৃহকর্মী। আই এল ও-র হিসাব অনুযায়ী এই গৃহকর্মীদের মধ্যে ৮৩ শতাংশ নারী।

কেন্দ্রীয় সরকার গৃহকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট, মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট, পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যাক্ট, ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন অ্যাক্ট, মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট, কনট্র্যাক্ট লেবার অ্যাক্ট, ইক্যুয়াল রেম্যুনারেশন অ্যাক্ট ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনার আওতায় এনেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আই এল ও-র এখনকার বক্তব্য। তাঁরা গৃহকর্মী কথাটির ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। বিশেষ কতগুলি কাজকে তাঁরা গৃহকর্মের আওতায় এনেছেন। যেমন, শিশুর যত্ন, রুগ্ন এবং বয়স্কদের সেবা, রান্না, গাড়ি চালনা, বাগান করা, বাসস্থান সংরক্ষণ, ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গৃহকর্মীদের জন্য বিভিন্ন আইন এসেছে। কর্ণাটক সরকার এই কর্মীদের ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা করেছে। তামিলনাড়ুতে ম্যানুয়াল ওয়ার্কার্স অ্যাক্টের মধ্যে আনা হয়েছে গৃহপরিচারকদের। মহারাষ্ট্র সরকার স্টেট পাবলিক সার্ভিস কন্ডাক্ট অ্যাক্ট ১৯৯৭তে বলেছে কোন সরকারি কর্মচারী ১৪ বছরের নীচে কাউকে নিয়োগ করতে পারবে না। কেরালাও একই পথে হেঁটেছে। প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ইত্যাদিতেও আইন আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ ধরণের কোন আইন হয়নি। প্রশ্ন ওঠে যে তা কি মধ্যবিত্ত ভোট ব্যাঙ্কের জন্য? কিন্তু যে রাজ্যগুলিতে আইন এসেছে, তাদেরও তো এ সমস্যা ছিল। তবে এখানে কি কাজ করেছে তীব্র রাজনৈতিক অনীহা! একটি শ্রেণীকে কেবল সর্বহারা বলে চিহ্নিত করে মানসিক তৃপ্তি পেতে চেয়েছে শাসকরা? পরিবর্তনের পর কি হয় সেটাই দেখার।

প্রজ্ঞাপারমিতা

গঠিত হলো এন জি ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

গত ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার স্টুডেন্টস হলে অধিকারের দাবীতে এন জি ও কর্মচারীদের এক সমাবেশ থেকে গঠিত হল 'এন জি ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি'। সম্ভবত গোটা ভারতে এন জি ও কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মঞ্চ এই প্রথম। সমাজে বিভিন্ন শোষণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি, সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজমনস্ক চিন্তাশীল মানুষরা সোচ্চার হয়েছেন, পথে নেমেছেন। কিন্তু এন জি ও কর্মচারীদের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমাজের কোন প্রান্ত থেকেই কোন প্রতিবাদ, প্রশ্ন ওঠেনি। তাই এন জি ও কর্মীরা বাধ্য হয়েই নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে শুরু করল। গড়ে উঠল এন জি ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক পাঁচ হাজারের মতো এন জি ও (NGO) সংস্থা আছে। আনুমানিক এদের কর্মী সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এই কর্মীরা অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীর। এরা কাজ করেন মূলতঃ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্ন মধ্যবিত্ত গরীব প্রান্তিক মানুষের মধ্যে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি এদের গণভিত্তি। এই গণভিত্তিকে ভর করেই এন জি ও সংস্থাগুলি সরকারী, বেসরকারী, দেশী, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করে। সংস্থাগুলির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে এই সব সমাজকর্মী বা এন জি ও কমী।

এই সব কর্মীরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে বৌদ্ধিক ও কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে চলেছেন। তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সংস্থাগুলি হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশী বরাদ্দ অনুদান পেয়ে থাকে। এই সব সংগঠন/সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা পান সমাজসেবী হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি, শংসাপত্র, প্রশংসা, সেরা বাঙালি পুরস্কার, ইত্যাদি। নিজেদের জীবন যাত্রার মান বজায় রাখেন যে কোন কর্পোরেট হাউসের কর্তাব্যক্তিদের সমতুল্য। অথচ বিভিন্ন প্রকল্পের অনুদানের অর্থ পাওয়ার জন্য যে কাজের মূল্যায়ন হয় বা স্বীকৃতি পায়, তার সিংহভাগ সফলতা নির্ভর করে এই সব কর্মীদের নিরলস শ্রম ও নিষ্ঠার ওপর।

এই সব এন জি ও কর্মীদের নিজস্ব আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরীর থেকেও অনেক কম পারিশ্রমিকে এদের কাজ করতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে। সহ্য করতে হয় কর্তৃপক্ষের অপমান, অত্যাচার ও জুলুম। ইচ্ছামতো ছাঁটাই, সাময়িক বরখাস্তের কোপ হামেশাই নেমে আসে এই সব কর্মীদের ওপর। বেশী টাকার ভাউচারে আগাম সই করিয়ে রাখা, সাদা কাগজে সই করিয়ে রাখা কিছু কিছু এন জি ও কর্তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পি এফ, গ্র্যাচুইটি, ক্যাজুয়াল/মেডিক্যাল লিভ কিংবা মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি না দেওয়া, এন জি ও গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। না আছে শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি, না আছে শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। এই সবের বিরুদ্ধে মুখ খুললে, প্রশ্ন তুললে কপালে জুটবে কর্মচ্যুতির খাঁড়া, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, ছাঁটাই। এইসব সংস্থার কর্মীরা তাদের নিজস্ব জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে অপারগ। পরিবারের সদস্যদের ঠিকমতো ভরণ পোষণ দিতে পারেন না। পারেন না প্রয়োজনীয় খাবার, চিকিৎসা, বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে।

সংবিধানে বেঁচে থাকার যে মৌলিক অধিকার, আইনী অধিকার ও সুরক্ষার কথা বলা আছে তা আদায় করার জন্য এন জি ও কর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মঞ্চ গড়ে ওঠা দরকার বলে তারা মনে করেন। তাই গড়ে উঠলো এন জি ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। এন জি ও কর্মীদের ন্যায্য দাবীগুলি নিয়ে সঠিক আন্দোলন গড়ে উঠলে শুধু এই মানুষগুলোর জীবনের মানের উন্নতি ঘটবে না, একই সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজেও গতি আসবে। আসবে সংস্থাগুলির স্বচ্ছতা।

২০১৪-র কলকাতা বইমেলায় নাগরিক মঞ্চ পঁচিশ-এর প্রথম প্রকাশনা

মানুষের অধিকার — চলমান সংগ্রাম

শতাধিক আইন ও মানবিক অধিকারের এক মূল্যবান সংগ্রহ

সংগ্রাহক : নব দত্ত

প্রায় ৪০০ পাতার বইটির আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ৩০০ টাকা

*১০ জানুয়ারী ২০১৪-র মধ্যে যারা অগ্রিম জমা দেবেন তারা **২০০ টাকায়** বইটি পাবেন*

টাকা পাঠান চেক/ড্রাফ্ট 'নাগরিক মঞ্চ'-র নামে অথবা সরাসরি এস বি আই অ্যাকাউন্টে (নং: ১০৯৫৯২৩২৫৪০)

নাগরিক মঞ্চ - ফিরে দেখা

বেলেঘাটার সেই বাপীর বাড়ী যেখানে আমরা তপন মিত্রের পরামর্শমত প্রতি বুধবার সন্ধ্যেবেলায় বসতাম। তপনদাই বলেছিলেন, সংগঠন গড়ার আগে তিনমাস এভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বসে প্রমাণ হোক যে, আমরা কতটা দায়িত্বসচেতন। তারপর না হয় ভাবা যাবে। অফিসের কাগজপত্র, বই রাখার সেল্ফ দরকার, মুশকিল আসান বাপী হাজির। কোথায় এক দোকানের সেল্ফ সব সস্তায় বিক্রি করে দিচ্ছে, কিনে নাও। ঘরে সিলিং ফ্যান নেই? নান্টুদা বললেন আমি দেবো।

নাগরিক মঞ্চ শুরুটা এভাবেই হয়েছে। আজও সেভাবেই চলছে। প্রথমদিকে আমাদের বেলেঘাটার অফিসে ভয়ঙ্কর গরমে কাজ করা যেত না, তার উপরে এত ফাইল, বই, নিজেদের প্রকাশনার যাবতীয় কাগজ। একটাই ৮ বাই ৯ ঘর। আজও অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তবে ডকুমেন্টেশন, লাইব্রেরী আলাদা অফিস/ঘর হয়েছে।

মঞ্চের নিজস্ব প্রকাশনার সংখ্যা ১৩০ — তার মধ্যে অন্ততঃ ৪০-৫০টা এখনও পাওয়া যায়। সেই হাজার হাজার বই-এর স্টক রাখার জন্য একটা ঘর পাওয়া গেছে। সবটাই সহৃদয় সহযোগী/বন্ধুদের সহায়তায়।

সংগঠনের বয়স এবছর ২১ সেপ্টেম্বর ২৫ বছর হল। আমাদের বয়সও ২৫ বছর বেড়েছে। যারা সেদিন শুরু করেছিলাম বাপীর মত বন্ধু অকালে চলে গেছে। বিজয়দা, অজিতদা, বীরেনদা, অনিরুদ্ধদা, দাশদা, রণজিৎদা, গোপালদা, সুনীলদা, ভজনদা, কমলাপতিদা, সমরদা, এরাও একে একে ছেড়ে গেছেন। আজও এদের পরামর্শ, সহৃদয় ভালবাসা, দায়বদ্ধ ভূমিকার কোনো তুলনা হয় না। সত্যি বলতে কি যারা চলে গেছেন তাদের শূণ্যস্থান পূরণ সহজ ছিল না— আজও হয়নি।

গত ২৫ বছরে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজ

● ১৯৮৯, ২১ সেপ্টেম্বর বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প নিয়ে নাগরিক কনভেনশন, বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মোকাবিলায় 'বি আই এফ আর' এবং 'কামানি টিউবসের ইতিকথা' পুস্তিকা প্রকাশ।

● ১৯৯০ পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সমবায়গুলি নিয়ে সমীক্ষা প্রকাশ এবং সেইসব শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষদের নিয়ে প্রজ্ঞানন্দ সভাগৃহে মিটিং।

● ১৯৯০ মে দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত শ্রমিকদের অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিকল্প মঞ্চের প্রতিবেদন— Labour in West Bengal : Alternative View প্রকাশ। ১৯৯১-এ Against the Wall, পরের বছরগুলিতে ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪ 'আক্রান্ত শ্রমিক' বাংলায় প্রকাশ।

● ১৯৯০ এর ২১ সেপ্টেম্বর দিনটিকে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের সমর্থনে সংহতি দিবস হিসেবে প্রচার কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রতিবছর এই দিনটি জুট-শ্রমিক রাজেশ্বর রাই দিবস হিসাবে পালন করা হয় মিছিল এবং সভার মাধ্যমে।

● ১৯৯১ এর ২১ সেপ্টেম্বর ছয়টি শিল্পাঞ্চলের প্রায় দশ হাজার শ্রমিক পাঁচটি দাবীর ভিত্তিতেএকটি ব্যাজ পরেন। ঐ দিন সকালে প্রায় ২৫টি কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের স্ব-স্ব শিল্পে জমায়েত হয়ে প্রায় পনেরো হাজার লিফলেট প্রচার করেন। বিকেলে কেন্দ্রীয় সভা হয়।

● ১৯৯২ এর ২১ সেপ্টেম্বর নাগরিক মঞ্চের পক্ষে পশ্চিবঙ্গের বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প বিষয়ে সরকারের শ্রমনীতিকে কেন্দ্র করে ২২ দফা বিকল্প প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়।

● ১৯৯৪ এর ঐদিন একই দাবীতে পনেরো হাজার নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবীপত্র তদানীন্তন শিল্পপুনর্গঠন মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে জমা দেওয়া হয়।

● ১৯৮৯ - ১৯৯৪ প্রতিটি লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও রাজ্য সরকারের বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প সংক্রান্ত নীতি ও আমাদের দাবী নিয়ে ভোটারদের কাছে আবেদন জানিয়ে পঞ্চাশ হাজার প্রচারপত্র বিলি করা হয়, এবং একে কেন্দ্র করে মিছিল, সভা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর কলকাতায় আসেন — দুর্নীতিপরায়ণ কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার দাবীতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বি আই এফ আর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সভা হয়।

● ১৯৯১ - এ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নতুন অর্থনীতি চালু করা হয়। মঞ্চ বর্তমান আর্থনীতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিক নেতাদের নিয়ে আলোচনা সভা করে। আলোচনায় অংশ নেন কল্যাণ দত্ত, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, অজিত নারায়ণ বসু, সিদ্ধার্থ সেন, প্রণব বসু, বীরেন রায়, জলি কল প্রমুখ। এদের বক্তব্য নিয়ে 'বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি' নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়।

● ১৯৯১ থেকেই শুরু হয় প্রতি বছর কোন না কোন প্রয়াত শ্রমিক সংগঠক, নেতা, সহযোগী বুদ্ধিজীবীর নামে শ্রমজীবী মানুষের প্রাসঙ্গিক সমস্যা নিয়ে স্মারক বক্তৃতা। এপর্যন্ত এই স্মারক বক্তৃতা/আলোচনায় অংশ নিয়েছেন ঃ সুধী প্রধান, গৌতম সেন, শঙ্কর গুহ নিয়োগী, এ কে রায়, গণেশ রাম, জি থঙ্কপ্পন, অশোক চৌধুরী, রণেন সেন, বীরেন রায়, সৌরীন বসু, অজিত নারায়ণ বসু, কাশীকান্ত মৈত্র, গোপাল চক্রবর্তি, কুণাল দত্ত, তপন মিত্র, দেবদাস ব্যানার্জী, অঞ্জন চক্রবর্তী, ব্যাসদেব দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ ধর, অজিজিৎ গুহ, শুভেন্দু দাশগুপ্ত,প্রণব দে প্রমুখ।

● ১৯৯২ চটশিল্পে ধর্মঘট ডাকা হয়। পাটশিল্পের সাথে যুক্ত ৫টি কারখানাভিত্তিক ইউনিয়নের সাথে যুগ্মভাবে একটি লিফলেট প্রকাশ করা হয়। হিন্দী এবং বাংলায় মঞ্চ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৯৯৩ ডিসেম্বরে চটশিল্প ও শ্রমিকদের নিয়ে বাংলায় আরো একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। পাটজাত দ্রব্যের বিকল্পের খোঁজে এক আলোচনা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন তদানীন্তন পাটজাত দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ অশোক মজুমদার, রামকৃষ্ণ মিশনের কামারহাটি মিনি জুট প্রকল্পের ডাইরেক্টর শিশির মিত্র প্রমুখ। ১৯৯৫ নভেম্বরে চটশিল্পের ধর্মঘটকে সরাসরি নাগরিক মঞ্চ বিরোধিতা করে সাংবাদিক সম্মেলনে। পাট চাষ ও তার সাথে যুক্ত কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা সহ চটশিল্প ও শ্রমিকদের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয় 'পাটশিল্পে হচ্ছেটা কি?' এই অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের আগে আমরা পাটচাষ অঞ্চলে কয়েকটি সমীক্ষা চালাই পাটচাষে যুক্ত কৃষকদের মধ্যে। এই অনুসন্ধানে চটশিল্পের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ধরা পরে।

● ১৯৯১-এর ৭ জুলাই নাগরিক মঞ্চ-এর প্রস্তুতিপর্ব প্রথাগতভাবে শেষ হয়। সংগঠন ১৯৮৯ থেকে কোনো সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়া শুধুমাত্র একজনকে আহ্বায়ক করে চলছিল। এবার লিখিত উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে স্থায়ী সংগঠন হিসাবে কাজ শুরু করে। ২৫ সেপ্টেম্বর. ১৯৯১ কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সক্রিয় কর্মীদের সভায় ঠিক হয় সংগঠনের কাজের পরিধি ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ ঠিক হবে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় —

(ক) নিয়মিত বুলেটিন (মাসিক নাগরিক মঞ্চ) প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর বদলে ইস্যু ভিত্তিক পুস্তিকা প্রকাশ, নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে প্রচার পুস্তিকা এবং অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।
(খ) ডকুমেন্টেশন, অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করা হবে।
(গ) আইনী সহায়তার কাজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও গুরুত্ব দিয়ে করা হবে।
(ঘ) সহযোগী শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির সাথে যৌথ উদ্যোগে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রচার আন্দোলনকে সংগঠিত করা হবে।
(ঙ) সংবাদপত্রসহ অন্যান্য প্রচারের ক্ষেত্রে আলাদা করে নির্দিষ্টভাবে প্রচারকে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯৯২ ও ১৯৯৬-তে ই এস আই চিকিৎসা / শ্রমিক / বীমাকারীদের অবস্থা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। বাংলা, হিন্দী পুস্তিকা আকারে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

১৯৯৪-এ চটশিল্পের শ্রমিকদের বাসস্থান অর্থাৎ কুলি লাইন নিয়ে সমীক্ষা হয় যা 'আক্রান্ত শ্রমিক ১৯৯৪'-তে প্রকাশিত হয়।

১৯৯৩ থেকে মঞ্চের প্রকাশিত পুস্তিকা বিক্রয় ও প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা বই মেলায় অংশগ্রহণ করা শুরু হয়। কুড়ি বছর ধরে নাগরিক মঞ্চ বই মেলায় অংশ নিয়ে চলেছে।

মঞ্চের শুরুর দিনে যে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তা ছিল 'শিল্প বাঁচাও শ্রমিক বাঁচাও — শ্রমিক স্বার্থে শিল্প বাঁচাও', 'যার হাত আছে তার কাজ নেই — যার কাজ আছে তার ভাত নেই' এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। আজ পঁচিশ বছর ধরে অজস্রবার এই দাবী/স্লোগান নিয়ে মিছিল, সভা, প্রচার কর্মসূচী হয়েছে। লক্ষণীয় হল,পরিবর্তনের জমানায় এই স্লোগানটি আত্মস্থ করেছে সরকার, যদিও বলার মত শ্রমিকদের জন্য তেমন কাজ খুব একটা হয় নি।

(নাগরিক মঞ্চের কথা সংক্ষেপে চলবে ধারাবাহিকভাবে)

নাগরিক মঞ্চ এখন কলেজ স্ট্রীটেও

মডার্ন প্রিন্টার্স

২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ১২

দীপক কুন্ডু : ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

সুমন্ত : ৯১৪৩৭৮৬১৩৪

নাগরিক মঞ্চ : পঁচিশে পা

নাগরিক মঞ্চ -র জন্মদিন ২১ সেপ্টেম্বর। এখন থেকে ২৫ বছর আগে ১৯৮৯ সালে যাত্রা শুরু। সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য নিয়ে শুরু হল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩-র সভা। বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প শ্রমিক সহায়ক নাগরিক মঞ্চর এভাবেই নিজের কাজকে পরিচয়ে সেঁটে পথ চলার শুরু। তারপর আড়াই দশক। শিল্প, পরিবেশ, শ্রমিকের অধিকার, উন্নয়ন, প্রান্তিক মানুষের দাবী নিয়ে পাশে থাকা, সরকারকে প্রশ্ন করা। মে দিবসে শ্রমিকের ভুখা মিছিল, দূষণে আক্রান্ত শ্রমিক, চিঁচুড়গেড়িয়ার পাথরভাঙ্গা কলে অসুস্থ হয়ে কর্মরত ও মৃত আদিবাসীদের সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে ক্ষতিপূরণ আদায়। পেশাগত রোগ নিয়ে লাগাতার উদ্যোগ, বন্ধ পেনিসিলিন কারখানা খোলার দাবীতে এম আর টি পি কমিশন, বি আই এফ আরের দ্বারস্থ, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতার দাবী। এভাবেই তথ্যকে হাতিয়ার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অক্লান্ত শ্রমে এবং উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টার। নাগরিক মঞ্চের প্রকাশনা আক্রান্ত শ্রমিক, বিপন্ন পরিবেশ, নাগরিক মঞ্চ গ্রন্থমালা নানান দরকারি জানার বিষয় নিয়ে প্রায় দেড়শ প্রকাশনা। সম্পাদক জানালেন, ২৫ বছরের সংকল্পের কথা।

অনুষ্ঠানের দিন রামমোহন লাইব্রেরী হল প্রায় কানায় কানায় ভর্তি মানুষের উপস্থিতিতে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর নাগরিক মঞ্চ ওয়েবসাইটের সূচনা হল (www.nagarikmancha.org) তখন বিকাল ৫টা। মঞ্চের সহকর্মীদের কাছে স্বপ্নের মুহূর্ত। এভাবেই নাগরিক মঞ্চের বিশ্বায়ন ঘটল। প্রমাণ হল বয়স বেড়েছে। সক্রিয় সদস্য/সহযোগী সহ আমাদের অনেকের। কিন্তু উদ্যোগ, উৎসাহ কম কিসে? ঘোষণা হল, নাগরিক মঞ্চ মুখপত্র আবার প্রকাশ হবে। তার প্রস্তুতি চলছে। আইনি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে। খুব শীঘ্রই ডাক্তার বন্ধুদের সহযোগিতায় পেশাগত রোগ নির্ণয়ের মাসিক ক্লিনিক চালু হবে। প্রকাশ হবে ২৫ বছরের সংকলন — আপাততঃ এটাই।

আমাদের সাথে আরও অনেকের সাথে পথ চলেছেন অচ্যুতানন্দ দাশ—দাশদা। ২০০৯ সালে প্রায় ৯৫ বছর বয়সে প্রয়াত হন। যিনি আজীবন শ্রমিকের সাথে পারিপার্শিক সমাজের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তার স্মরণে বললেন বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত। এরপর শুরু হল অচ্যুতানন্দ দাশ স্মারক আলোচনা। শুরুতে সভার সভাপতি শুভেন্দু দাশগুপ্ত সূত্রপাত করে বললেন, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় শ্রম শ্রমিক উন্নয়ন। শ্রম, শ্রমিক, উৎপাদন সামাজিক প্রগতির প্রধান উপাদান, আর্থনীতিক অগ্রগতির বিশেষ উপকরণ, রাজনীতিক ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, এমন ছিল — আজও আছে। কিন্তু আর্থনীতিক ক্ষমতা এখন তা অগ্রাহ্য করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও রাজনীতিক ক্ষমতা এসবকে অস্বীকার করছে। আমরা নাগরিক মঞ্চ এমন অবস্থানের সমালোচক। আমরা আজকের নির্ধারিত বক্তাদের কাছ থেকে বুঝে নিতে চাইছি এই যে ক্ষমতার আক্রমণ এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রতিরোধের ছবিটা। আলোচনার সূত্রপাত করলেন কমল তেওয়ারি, তারপর বললেন কুশল দেবনাথ, সুদীপ্তা পাল, আশীষকুসুম ঘোষ, দেবাশীষ পাল। তাদের বক্তব্যে বেরিয়ে এল শ্র মিকের সংগ্রাম, দাবী আদায়ের সংকল্প। পুঁজির ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রমিকদের প্রত্যাশা, আন্দোলনের প্রতি মনোভাবে, মননে,অংশগ্রহণে শ্রমিকদের সম্পর্কে শূন্যতা, উন্নয়নে দুটি আলাদা বর্গের,শ্রেণীর অর্থাৎ পুঁজির, শ্রমিকের ভিন্ন বিপরীতমুখী দাবী ব্যবস্থার কথা। কয়লাখনি অঞ্চলে ঠিকা শ্রমিকদের শোষণের চিত্র, নৈহাটি অঞ্চলে জুট শ্রমিকদের বঞ্চনা, ট্রেড ইউনিয়ন তথা শাসকদলের আক্রমণ, প্রশাসনের মালিকদের প্রতি নির্লজ্জ, পক্ষপাত — এসব প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে আসে। কারখানার বাইরে যে অসংখ্য শ্রমজীবী, শ্রমিক-পেশাজীবী রয়েছেন, আলোচনায় তাদের কথা আসে। সেলস কর্মীদের উপর আক্রমণের উদাহরণ — এভাবেই আলোচনা চলতে চলতে নির্ধারিত সময় শেষ হয় ঘড়িতে তখন রাত ৮-১০ মিঃ।

সভায় যে যার মত করে বললেন শ্রমিকের পক্ষে, শ্রমিকের অসহায়তা, শ্রমিকের ওপর আক্রমণ, সরকারের ভূমিকা, পুঁজির স্বেচ্ছাচার, প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের শাসকদলের প্রভাবিত ইউনিয়নের প্রশাসনিক সহায়তায় আক্রমণ, শ্রমিকের আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতা, আপোষ, সংগ্রাম, সবটাই — অনেকটাই। এভাবেই ২৫ বছরে পা দিল নাগরিকমঞ্চ।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে দীপঙ্কর বসু ও স্বাতী গুপ্ত কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, ব্লক বি, রুম ৭, কলকাতা - ৮৫ থেকে প্রকাশিত
ফোন : ২৩৭৩ ১৯২১, ৯৮৩১১৭২০৬০
এবং প্রিন্ট ডট কম, ই-৬/৯ পূর্ব্বাশা হাউজিং এস্টেট, ১৬০ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা - ৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৯৮৩০৩৫৯৭২২
বিনিময় মূল্য : পাঁচ টাকা